অন্তর্জলি

(গল্পগ্রন্থ – মুখোশ ও মুখশ্রী)

বাংলা ১২৭৫ সাল।

ডুমুরদহের গঙ্গার ঘাটে বিখ্যাত পাঁচালীকার ও কবিগান-রচয়িতা দীনদয়াল চক্রবর্তীকে অন্তর্জলির জন্যে আনা হয়েছে। সঙ্গে আছে চক্রবর্তী মহাশয়ের দুই পুত্র দেবীপ্রসাদ ও রামপ্রসাদ, ভ্রাতুস্পুত্র রামনিধি এবং পাঁচালীর দলের পুরাতন দোহার ষষ্ঠী সামন্ত। তা ছাড়া আছে একটি চাকর, নাম যদু।

দীনদয়াল চক্রবর্তীকে ডুমুরদ' ঘাটে অন্তর্জলির জন্যে আনা হয়েছে, এ সংবাদ লোকমুখে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো অতি অল্প সময়ের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে চারিধার থেকে দলে দলে লোক আসতে শুরু করলো সকাল থেকে। যারা আসে, তারা চক্রবর্তী মশায়কে দেখে, পায়ের ধুলো নেয়, চলে যায়। কাউকে দাঁড়াতে দেওয়া হয় না, তাহলে অল্প সময়ে বেজায় ভিড় জমে যাবে।

জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবীপ্রসাদ সকলকে হাতজোড় করে বলচে, "আমার বাবার শেষকালের ক্রিয়াগুলো একটু শান্তিতে করতে দ্যান আমাদের। ভিড় করবেন না, দয়া করে চলে যান। দেখা তো হোল, আবার গাছতলায় দাঁড়িয়ে কি দেখবেন? তামাক এখানে না, এগিয়ে গিয়ে খান। বাঁধানো বটতলায় চলে যান।"

সুবোধ লোকেরা চলে যাচ্ছে। বলতে বলতে যাচ্ছে, "আহা-হা, দীনদয়াল চক্কতি চললেন! আহা-হা!"

ওদের চোখে জল।

"অমন অনুপ্রাস আর কেউ লাগাতে পারবে না— আহা-হা!"

"বাংলাদেশের হয়ে গেল! কি লোকই চলে যাচ্ছে!"

"ইন্দ্রপাত হয়ে গেল!"

"দেখলেও পুণ্যি হয়। চেহারা যেন সাক্ষাৎ শিব। চললেন।"

"বর্ধমান আজ অন্ধকার হয়ে গেল।"

"বর্ধমান বুঝি মশায়ের বাড়ি? উনি সারা বাংলাদেশের, শুধু বর্ধমান কেন?"

"ওঁর জন্মভূমি বর্ধমান তাই বলচি। বর্ধমানের চাঁপা গ্রামে! কাঁকট পরগণা।"

দুর্বুদ্ধি-লোকেরা একবার চলে গিয়ে আবার ঘুরেফিরে আসে।

"নাভিশ্বাস উঠেছে নাকি? ও, এখনো ওঠেনি? আহা-হা!"

"যাবোই তো মশায়, থাকতে আসিনি। অমন লোকটা আহা, চলে যাচ্ছেন! আহা-হা!"

"আমাদের ঝাঁপাই গ্রামে কুণ্ডুদের বাড়ি পুজোর সময় বাঁধা আসর ছিল চক্রবর্তী মশায়ের। লোকে বসে গান শুনতে শুনতে অবাক হয়ে যেত। ওঁর গান সকলের মুখে মুখে।"

নিকটেই বর্ধমান রাজার কাছারি। সেখানকার নায়েব নরহরি জোয়ারদার স্বয়ং এসেছেন দেখতে। দুর্ধর্ষ নরহরি জোয়ারদার, এ পরগণায় সাত-সাতটা দাঙ্গায় যিনি স্বয়ং ঘোড়ায় চড়ে লেঠেল-পাইক পরিচালনা করেছেন, বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খায় যাঁর প্রতাপে। নরহরি বসে আছেন চক্রবর্তী মশায়ের বিছানার কিছু দূরে, বলছেন,—"কোনো ত্রুটি না হয় ব্যবস্থার। সব আমি ঠিক করে দেবো। আমার পাইক এখানে বসে থাকবে সন্দে পর্যন্ত। যখন যা দরকার হয়—"

দেবীপ্রসাদ বল্লে—"আপনার দয়া নায়েব মশায়। রাত্রে আজ দু'জন লেঠেল এখানে থাকা দরকার। এখনো নাভিশ্বাস ওঠেনি, রাত নেবে বলে মনে হচ্চে।"

"এক্ষুনি সব ঠিক করে দিচ্চি। ভেবো না বাবাজি। তুমি আর তোমার ভাই শুধু চুপ করে বসে থাকো। এ আমাদের দায়।"

"আপনি আর একবার আসবেন তো?"

"আমি আসবো সন্ধ্যাহ্নিক সেরে। দপ্তরের আজ বড় ঝঞ্ঝাট। কিস্তির সময় কিনা। ওটা কি হে?"

"আজ্ঞে এখানা বাবার গানের খাতা। উনি বল্লেন, অন্তর্জলি করবার সময়ে ওঁর হাতে এখানা রাখতে।"

"দেখি দেখি!"

নরহরি খাতাখানা উলটে-পালটে দেখে বল্লেন, "শ্যামাসঙ্গীত! আহা কি অনুপ্রাসের ঘটা! কি বাঁধুনি— এইখানটা দ্যাখো— বল্ দেখি মা কোন্ রক্ষে ত্রিবিভঙ্গে রঙ্গক্ষেত্রে রঙ্গ দ্যাখো— আহা-হা, ক্ষণজন্মা পুরুষ। আর জন্মাবে না। হয়ে গেল। পিদিম নিভে গেল।"

দেবীপ্রসাদের চোখ ছাপিয়ে জল পড়তে লাগলো। নরহরি বল্লেন—"সংসার অনিত্য। চিরদিন বাপ-মা থাকে না—কেঁদো না বাবাজী! হ্যাঁ, বাপের মতো বাপ। যাকে বলে দিগ্‌বিজয়ী বাপ। চোখের জল ফেলবার বহু সময় পাবে বাবাজী, এখন যাতে ওঁর শেষ কাজগুলি ঠিকমতো করতে পারো—"

দীনদয়াল চক্রবর্তীর বয়েস হয়েছে ছিয়াত্তর-সাতাত্তর। দোহারা, চেহারা বেশ ফর্সা রং, এই বয়েসেও বেশ সুপুরষ। কবির গান গেয়ে অর্থ ও খ্যাতি উভয়ই তাঁর ভাগ্যে জুটেছে। স্বগ্রামে প্রায় ৫০/৬০ বিঘে জমি ও কয়েকটি আম-কাঁটাল বাগানের তিনি মালিক। এই জমির মধ্যে অর্ধেক আন্দাজ বর্ধমান রাজার ব্রহ্মোত্তর—বাকি তিনি কিনেছিলেন। তাঁর সদ্ব্যয়ও ছিল যথেষ্ট, বাড়িতে দুর্গোৎসব করতেন খুব জাঁকিয়ে, পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ব্রাহ্মণভোজন কাঙালিভোজন যেভাবে নিস্পন্ন হোত, এদেশের অনেকে তেমনটি চোখে দেখেনি। গত বৎসর ছিল ঘোর দুর্ভিক্ষের বছর, চালের মণ সাড়ে তিন টাকা চার টাকা পর্যন্ত উঠেছিল, অনেককে অনাহারে থাকতে হয়েছিল, তাতেও চক্রবর্তী মশায় পিতৃশ্রাদ্ধের কোনো অঙ্গ বাদ দেননি। পাঁচমণ ধানের খইমুড়কি বিলিয়েছিলেন কাঙালিদের মধ্যে।

দীনদয়াল চক্রবর্তীকে ওই যে রাখা হয়েছে গঙ্গার ঘাটের চালাঘরে, মাটিতেই বিছানা পেতে দেওয়া হয়েছে— সমস্তদিন কেটে গেল, ওঁর নাভিশ্বাস উঠলো না। সন্ধ্যার সময় তিনি ক্ষীণস্বরে ছেলেদের কাছে ডাকলেন।

—"বাবা পটল, তোমাদের খাওয়া-দাওয়া—"

—"বেশি কথা বলবেন না বাবা।"

—"লোকজনের ভিড় কমেছে?"

—"এখন সবাই চলে গিয়েচে বাবা।"

—"বোসো এখানে।"

—"এখন কেমন আছেন?"

—"ভালো না। সংকীর্তন এল না?"

—"গঙ্গাটিকুরির কীর্তন আনতে লোক গিয়েচে, এল বলে।"

—"আমায় একটু নাম শোনাও।"

—"বেশি কথা বলবেন না বাবা।"

দেবীপ্রসাদ বাবার মুখে কুশি করে গঙ্গাজল দিল। বল্লে, "একটু ঘুমুবার চেষ্টা করুন বাবা।"

বাইরে এসে সে লোকজনদের বল্লে, "বাবা এখন দিব্যি কথাবার্তা কইলেন। বেশ জ্ঞান আছে এখনো।"

একজন বল্লে, "থাকবে না? পুণ্যাত্মা লোক যে। ওসব লোক সজ্ঞানে দেহত্যাগ করে। যে-সে লোক তো নয়।"

সন্ধ্যা নেমে এল। নিস্তব্ধ তারা-ভরা রাত্রি।

শ্মশান-চালার অদূরে কয়েকজন লোক বসে রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত। ওরা ডুমুরদ'র হাট থেকে কুমড়ো কিনে এনেচে, পটল কিনে এনেচে। ষষ্ঠী সামন্ত বসে কুমড়ো কুটচে। দেবীপ্রসাদ বল্লে, "ষষ্ঠী কাকা, বাবাকে একবার দেখতে গেলে না?"

—"দেখতে যাবো কি, কর্তার মুখের দিকে তাকালে বুক ফেটে যাচ্ছে। আজ এগারো বছর কর্তার সঙ্গে তেনার দলে ঘুরছি। কত বড় বড় আসর মাত করেছেন কর্তা। আমাকে বড্ড ভালোবাসতেন, ছোটো ভাইয়ের মতো। উনি চলে যাচ্চেন, আমার দাঁড়াবার ঠাঁই নেই। খাবো কি তাই হয়েচে ভাবনা। তুমি দল করো বাবাঠাকুর, আমি সেই দলে আসবো। কর্তার নামে দল চলবে।"

—"পাগল! আমি আর বাবা! গাইবে কে!"

—"গাইবে তুমি বাবাঠাকুর। আমার পরামর্শ শোনো। সব শিখিয়ে পড়িয়ে দেবো। আমার সব ঘাঁৎ-ঘোঁৎ জানা আছে। সোনার দলটুকু, এ ছেড়ো না বাবাঠাকুর, এতেই তোমাদের সংসারে লক্ষ্মী।"

—"আমার ভরসা হয় না ষষ্ঠী কাকা, দেখি কি হয়। বাবা যা রেখে যাচ্চেন, দু'ভাইয়ের অভাব হবে না। দলের ঝন্‌ঝাটে আর যাবো না। ও সব আমার কর্ম নয়।"

কিন্তু যাঁকে কেন্দ্র করে আজকার এই সব ব্যাপার, তিনি সম্পূর্ণ সচেতন রয়েচেন, নাভিশ্বাস ওঠা তো দূরের কথা!

চোখ বুজে আছেন যে, সে শুধু ভীষণ শারীরিক দুর্বলতার জন্যে।

এক-একবার ছেলেদের ডাক দিচ্ছেন, "বাবা পটল—বাবা রামু—এদিকে এসো—"

কিন্তু সে-ডাক ছেলেদের কানে গিয়ে পৌঁছুচ্চে না। আসলে চক্রবর্তী মশায়ের মনেই সে আহ্বানের আসন, কণ্ঠস্বরে রূপান্তরিত হচ্চে না সে-ইচ্ছে, অথচ চক্রবর্তী মশায় ভাবচেন, তিনি ঠিকই ডেকেচেন ছেলেদের।

"ওরা কেন আসচে না? তাই তো—"

চক্রবর্তী মশায় আবার চোখ বুজলেন।

আজ সারাদিন তিনি অতীত জীবনের বহু হারানো মুহূর্ত আবার আস্বাদ করেচেন। যা ভুলে গিয়েছিলেন, তা যে এত স্পষ্ট হয়ে অঙ্কিত ছিল স্মৃতির পটে কে তা ভেবেছিল?

প্রথম যৌবনের সে-সব গৌরবময় দিন। হরু ঠাকুর তখন ছিলেন চক্রবর্তী মশায়ের আদর্শ। ইলছোবা-মোল্লাই গ্রামের বারোয়ারিতে বড় আসরে হরু ঠাকুরের কবিগান যখন শোনেন, তখন কত বয়েস হবে তাঁর? বছর সতেরো-আঠারো হয়তো!

আজও মনে আছে সে-রাত্রের কথা।

ভাষার অমন ফুলঝুরি আর তিনি কখনো দেখেননি, শোনেননি। মনে হল যেন দেখচেন বিখ্যাত কবিওয়ালা হরু ঠাকুরের মুখে মুখে ভাষার যে অপূর্ব সৃষ্টি। হরু ঠাকুর একদিকে, অন্যদিকে গদাধর মুখুজ্যে—দুই বিখ্যাত কবিওয়ালা। আসরের লোকের মুখে শব্দ ছিল না। পুতুলের মতো সবাই বসে আছে।

'সুধীর ধারে বহিছে এই ঘোরতর রজনী

এ সময়ে প্রাণসখী রে কোথায় গুণমণি, ঘন সবাজ ঘন শুনি।

ঐ ময়ূর ময়ূরী হরষিত, হেরি চাতক চাতকিনী

ঐ কদম্ব কেতকী চম্পক জাতি সেঁউতি শেফালিকে

ঘ্রাণেতে প্রাণে মোহ জন্মায় প্রাণনাথে গৃহে না দেখে।

বিদ্যুৎ খদ্যোত দিব্য জ্যোতির্ময় প্রকাশে দিনমণি

প্রিয়মুখে মুখ দিয়ে সারিশুক থাকে দিবস রজনী।'

সতেরো বছরের যুবকের চোখের সামনে হরু ঠাকুরের গান এক নতুন সৌন্দর্য-জগৎ খুলে দিয়েছিল। সেদিন থেকে তাঁর মনে মনে দুরাশা জাগলো যদি কোনোদিন কবিওয়ালা হতে পারেন, অমন ভাষার ফুলঝুরি ছোটাতে পারেন মুখে মুখে, তবেই জীবন সার্থক।

ভোর হয়ে গিয়েছিল আসর ভাঙতে। সঙ্গে তাঁর ছিল আর একটি লোক, তাঁরই মতো অল্প বয়স। দু'জনে আসরের বাইরে এসে একটা গাছতলায় বসলেন। সঙ্গের সে ছেলেটি অন্য কথাবার্তা পাড়লে, কিন্তু দীনদয়ালের ওসব ভালো লাগছিল না।

তিনি সঙ্গীকে বল্লেন, "হরু ঠাকুর কোথায় বাসা করেচেন ভাই?"

সে বল্লে, "জয়বাবুদের চণ্ডীমণ্ডপে। কেন?"

—"দেখে আসি। অমন লোক!"

—"গদাধর মুখুজ্যেও কম নয়। উনিও ওখানে আছেন।"

—"চলো যাই।"

—"সারা রাত গান করে এখন ওরা ঘুমুবে, না তোমার সঙ্গে বকবক করবে! এখন যেয়ো না।"

—"তুমি বাড়ি যাও। পিসিমাকে বোলো আমি ওবেলা যাবো। ওঁদের একবার ভালো করে না দেখে যাবো না। কিছু ভালো লাগচে না ভাই।"

সঙ্গী হেসে বল্লে, "পাগল হলে নাকি? চলো বাড়ি যাই। কি হবে ওদের সঙ্গে দেখা করে?"

কিন্তু যুবক দীনদয়াল সেদিন বাড়ি ফিরে যাননি। হরু ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করবার ফলে তাঁর নেশার ঘোর আরো বেড়ে গেল। এরা মানুষ না দেবতা? মানুষের মুখের ভাষা এমন সুন্দর হতে পারে?

আর সে সব দিনের কথা এত মনে আসচে কেন?

আর একজনের কথা বড্ড মনে হয়।

সে একটি নব প্রস্ফুটিত নলিনীর মতো নির্মল ও পবিত্র ছিল। জাতিতে ছিল কলু, ব্রাহ্মণেরা ওদের জল স্পর্শ করে না। কিন্তু আজ এ কথা ভেবে চক্রবর্তী মশায়ের বিন্দুমাত্র অনুশোচনা হচ্চে না যে তিনি তার রান্না ভাত খেয়েচেন। তার হাতের জল খেয়ে তৃপ্ত হয়েচেন। আজকার দিনের সাত্ত্বিক, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ দীনদয়াল চক্রবর্তীর সে-খবর কেউ জানে না।

আকাশে বাতাসে সে-সব দিনে কেমন মাদকতা ছিল, মনে ভাবের অফুরন্ত জোয়ার অনুকূল বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বইতো। রাসু নৃসিংহের সে-গান তখন সব সময় মনে গুনগুনিয়ে উঠতো—

সখি এ সকল প্রেম

প্রেম নয়।

ইহাতে মজিয়ে নাহি

সুখের উদয়।

অথবা—

মনে রইল মনের বেদনা

প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারে বলি বলি আর বলা হলো না।

সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।

মুমূর্ষু দীনদয়াল মনে মনে হাসলেন।

আজকালকার ছেলে-ছোকরা কি বুঝবে সে-সব প্রেমের কথা? ছেলে-বুড়ো নিয়েও কথা নয়, আসলে চাই প্রাণ। প্রাণের গভীরতা যদি না থাকে, অগভীর ঘোলা-জলে সাঁতার কাটলে কি মহাসমুদ্রের বাণী শোনা যায়? মনে পড়লো কানাইহাটির জমিদারবাড়ির নাটমন্দিরে নবাই ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সে বিখ্যাত কবিব লড়াই, যার ফলে তিনি বিখ্যাত হয়ে উঠলেন দেশে-বিদেশে—আজও সে সান্ধ্য-আসরটি, আসরের পাশের প্রাচীন কদম্ব গাছটি, সেই ভাঙা শ্যামরায়ের মন্দিরের চূড়াটি, এতকাল পরেও যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্চেন। নবাই ঠাকুরবিখ্যাত কবিওয়ালা, আর তিনি তখন সবে উঠচেন। লোক বলাবলি করতে লাগলো, এ ছোকরা এবার হাবুডুবু খাবে নবাই ঠাকুরের আসরে।

নবাই ঠাকুরের দোয়ারে গোপেশ্বর সাঁবুই এসে বিকেলে বল্লে, "ও ঠাকুর, তোমার পাখা উঠেচে?"

—"হ্যাঁ, এবার স্বর্গে যাবো।"

—"সাহস আছে তোমার। চলো, আমায় পাঠিয়ে দিলেন।"

—"কোথায় যাবো? কে পাঠিয়ে দিলেন।"

—"নবাইঠাকুর।"

—"তার এত মাথাব্যথা?"

—"অ্যান্টনি সাহেব ঘোল খেয়েছিল নবাইঠাকুরের কাছে, জানো তো? তোমাকে আর ফুঁ খাটাতে হচ্চে না সেখানে। এসো, নবাইঠাকুরের সঙ্গে একটা ষড় করো। আসরে যাতে—"

—"তোমার নবাইঠাকুরের ষড় করবার দরকার হয়, বলে দিয়ো, তিনি যেন আমার বাসায় পায়ের ধুলো দেন। আমি তাঁর সেখানে যাবো না।"

—"এত বড় আস্পর্ধা তোমার? আচ্ছা—"

দীনদয়াল নির্বোধ ছিলেন না। তিনি বুঝেছিলেন, নবাই ঠাকুর তার সামনে দাঁড়াতে ভয় পেয়েচেন। যত বড় এবং যত বুড়ো কবিওয়ালাই হোন না, অজ্ঞাতশক্তি প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনাসামনি প্রকাশ্য আসরে নামতে ভয় পাবেনই। নিজের শক্তির ওপর অতটা বিশ্বাস কারো একটা থাকে না। বিশেষ করে ওঁরা নাম-করা, ওঁদের সুনাম নষ্ট হবার ভয় আছে, দীনদয়াল ছোকরা-কবিওয়ালা, হেরে গেলেও লজ্জা নেই।

এই নবাই ঠাকুরই অ্যান্টনি সাহেবকে বলেছিল—

এ নহে অ্যান্টনি আমি একটা কথা জানতে চাই

এসে এদেশে এবেশে তোমার গায়ে কেন কুর্তিনাই?

সঙ্গে সঙ্গে অ্যান্টনি সাহেবের প্রত্যুত্তরে যেন বিদ্যুতের ঝলক খেলে গেল—

এই বাংলায় বাঙালির বেশে বেশ আনন্দে আছি
হয়ে ঠাকুর সিংয়ের বাপের জামাই কুর্তি টুপি ছেড়েছি।

ঠাকুর সিং নবাই ঠাকুরের অন্য নাম।

সন্ধ্যার পর আসর বসলো। কানাইহাটি মস্ত গাঁ, আসল ভর্তি হয়ে গেল সন্ধের আগেই। চারিধারে রটে গিয়েছিল বিখ্যাত নবাই ঠাকুরের সঙ্গে আসরে নামবে একজন ছোকরা কবিওয়ালা। সবাই মজা দেখতে জড়ো হয়ে গেল, পাঁচ-ছ'ক্রোশ দূরের গ্রাম থেকেও পানের পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে ছোলার ছাতু আর তেঁতুল বেঁধে নিয়ে লোকে এসেচে মজা দেখতে, নবাই ঠাকুরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছোকরা কেমন হাবুডুবু খায় নবাই ঠাকুরের হাতে, তাই দেখতে।

আসর বসবার দেরি নেই।

জমিদারদের নাটমন্দিরের একদিকে চিকের আড়ালে মেয়েদের বসবার আসন, অন্যদিকে কানাইহাটির বাবুদের বসবাস তক্তপোশ ও তাকিয়া। বাবুদের তখন নাম-ডাক আছে মাত্র কিন্তু সাবেক অবস্থা তখন আর ছিল না—হাতিশালা ছিল কিন্তু হাতির সন্ধান ছিল না। ষোলো বেহারার বড় পালকি নাটমন্দিরের পাশের ঘরে পড়েই থাকতো, কেউ চড়তো না তাতে। ঝাড়লণ্ঠন টাঙ্গানো হয়েচে, জাজিম পেতে দেওয়া হয়েচে কবির দলের লোকদের জন্যে, ঠিক আসরের মাঝখানে। তারই পাশে ছিল সেই প্রাচীন কদম্বগাছটা, এখনো সেই আসর, সেই উৎসাহ ও কৌতূহলে-মত্ত শ্রোতৃবৃন্দের জনতা—ওই তো ডুমুরদ' শ্মশানঘাটের ওই শ্মশানবন্ধুদের বিশ্রাম করবার ঘরখানার মতোই স্পষ্ট তাঁর কাছে। চোখের সামনে বেশ দেখতে পাচ্চেন।

তাঁর নিজের দলের দোহার তখন ছিল চন্দ্র মল্লিক। বুড়ো মানুষ, অনেক ভালো ভালো দল ঘুরে দাঁত পড়বার জন্যে চাকুরি খুইয়ে শেষে তাঁর দলে ঢোকে। বছর-দুই পরেই মারা যায় লোকটা।

চন্দ্র বল্লে, "বাবাঠাকুর, ওদের লোককে তাড়িয়ে দিয়ে ভালো করলে না। বড় জমকালো আসর হয়েচে, এতে হেরে গেলে বড় দুর্নাম রটবে—"

—"তোমার ভয় হচ্চে চন্দর খুড়ো?"

—"ভয় না, তবে তুমি ছেলেমানুষ, তাই ভাবছি।"

— "কিছু ভয় নেই। তুমি দেখে নিয়ো—"

—"মস্ত বড় কবিওয়ালা কিনা ঠাকুর সিং, শেষে নাস্তানাবুদ না হতে হয়!"

—"তোমার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে উতরে যাবো, দেখে নিয়ো।"

সত্যি, সে-সন্ধ্যায় একটা নতুন প্রেরণা ও উৎসাহের জোয়ার তিনি অনুভব করলেন নিজের মনের মধ্যে। আজ এই সমাগত কৌতূহলোজ্জ্বল জনসাধারণকে তিনি দেখিয়ে দেবেন, শুধু ইতর গালাগালি দিয়ে জয়লাভের মূল্য নেই, তিনি দেখাবেন ভাষার ও ভাবের মহিমা, নতুন ভাবে ঢেউ এনে দেবেন আজ কবির আসরে, গাইবেন সম্পূর্ণ নতুন ধরনের গীত, সন্ধ্যার আকাশ থেকে সে প্রেরণা আসচে, আসচে ওই প্রাচীন কদম্ববৃক্ষের শ্যামল শাখাপ্রশাখার ইঙ্গিত থেকে, তিনি বুঝতে পেরেচেন আজ তাঁর জীবনে এক মহাসন্ধিক্ষণ সমাগত।

সেদিনের কথা ভাবলে আজও তার মনে সেই অপূর্ব উন্মাদনা জাগে। এই মৃত্যুর দিনটিতেও। রসের ও ভাবের সে পুলক মানুষকে অমর, মৃত্যুঞ্জয়ী করে দেয় এক মুহূর্তে। সকলে তা কি বুঝতে পারে?

সাধারণে তার খবর কি জানবে?

সে বুদ্ধি এবং ভাবের সে গভীরতা ক'জনের মধ্যে আছে?

এমনকি তাঁর নিজের ছেলেরাও তার সন্ধান রাখে না। ওদের মাতুলবংশের বৈষয়িক স্থূল-মনের উত্তরাধিকার ওরা পেয়েছে, তাঁর নিজের রসেভরা ছন্দের অনুগত ভাবসুষমায় অবগাহন-স্নান-করে ওঠা মন ওরা লাভ করেনি।

কাকে কি বলবেন? কাকে কি বোঝাবেন?...

তারপর আরম্ভ হল কবির লড়াই। কিন্তু ইতর বা অশ্লীল একটি কথাও উচ্চারণ করলেন না তিনি। নবাই ঠাকুর যা খুশি বলে বলুক, তিনি তার উত্তর দিতে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে তাকে আক্রমণ করবেন না, এই সংকল্প নিয়েই তিনি আজ আসরে নেমেচেন।

বরং তিনি উলটোটাই গাইলেন।

নবাই ঠাকুরের সৃজনী-প্রতিভার প্রশংসা করলেন তিনি এ আসরে—

কাব্যবন বিচরণ সোজা কথা নয়।
কল্পনার ফুল যেথা ফুটে সমুচয়
ভাবের ভাবুক যিনি সুকবি-রতন
নবাই সে পুষ্পরাশি করেন চয়ন
বন্দি আমি তাঁর পদে নবাই সুন্দর
বাণীর দুলাল তাঁর সবই সুন্দর!

নবাই ঠাকুর ও তাঁর দোহার গোপেশ্বর অবাক হয়ে গেল, ওরা তার ঠিক আগেই দীনদয়ালকে লক্ষ করে বলেচে—

কালে কালে সব গেল কাল কাল রাতি
মোগল পাঠান হদ্দ হল ফার্সি পড়ে তাঁতি
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ মলো শল্য সেনাপতি।
আজব শহরে যথা শৃগাল ভূপতি!
তেলাপোকা হোল পাখি শিখী ছাতারিয়া
অর্বাচীন দীনু নাচে তাধিয়া তাধিয়া।

সে কথার ও-রকমের শ্রদ্ধাপূর্ণ উত্তর ওরা আশা করেনি। গোপেশ্বরকে কি ইঙ্গিত করলে নবাই ঠাকুর। গোপেশ্বর সুর বদলালে। দীনদয়াল নামের ওপর ওরা খুব কায়দা দেখালে।

কোথা ওহে দীননাথ, দীন দয়াময়
দীনহীনে দিন দিন হও হে সদয়।
জায়া কায়া মায়া লয়ে মত্ত হয়ে রই
দিনান্তে তোমার নাম প্রাণান্তে না লই।
মিথ্যা কথা জুয়াচুরি করি কদাচার
রাগ দ্বেষ অভিমান অর্থ অলঙ্কার
এ সকল মহাপাপে ডুবি সর্বক্ষণ
কি হবে আমার গতি পতিতপাবন?

উভয় দল এক হয়ে আসরের মধ্যে ভক্তির বন্যা ছুটিয়ে দিলে। শ্যামরায়ের পূজারি বৃদ্ধ মাধব পণ্ডিত দীনদয়ালের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। কানাইহাটির বড় বাবু গরদের জোড় বক্‌শিশ করলেন দীনদয়ালকে। দীনদয়ালের মধ্যে নতুন ভক্তির, ভাবের বীজ তখন সবে অঙ্কুরিত হয়েছে। প্রৌঢ় নবাই সে-পথে কখনো হাঁটেনি, কাজেই দীনদয়ালের গান আসরের সকালের প্রাণে রসের ছোঁয়া দিয়ে গেল।

কিন্তু আজও একটা কথা দীনদয়ালের মনে হয়।

ধন্য নবাই ঠাকুর।

নিজেকে হঠাৎ সামলে নিয়ে নবাইঠাকুর যখন ভক্তির 'ছড়া' কাটতে শুরু করে দিলেন, তখন সে কি চমৎকার উজ্জ্বল অনুপ্রাসের ঘটা, বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো খেলিয়ে নিয়ে বেড়াল আসরে—

পাঁচভূতে সুগঠিত দেহ নবদ্বার
কোন্ মন্ত্রে ছাড়াইব ভূত আপনার
মন্ত্রতন্ত্র জলপড়া এ ভূতে না মানে
নিজমূর্তি ধরি ভূত পঞ্চভূতে টানে।
ভূতের জ্বালায় ভূতে সদা জ্বালাতন
কি হবে আমার গতি পতিতপাবন?

শেষরাত্রে আসর ভাঙলো। উভয় দল এমন গান জমিয়েছিল যে শ্রোতার দল উঠতে চায় না, আরো হোক, আরো চলুক, রাত ভোর হয়ে যাক, এমন সঙ্গীতমধু আর কখনো কেউ পান করায়নি এদের, রসের নেশায় ভাবের নেশায় এরাও উন্মত্ত হয়ে উঠেচে যেন, যেন নবদ্বীপে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সংকীর্তন বেরিয়েচে রাজপথে, আপামর জনসাধারণকে মাতিয়ে তুলেচে ভগবানের নামের অপূর্ব মহিমায়। নভোচারীর বায়ুপথ ত্যাগ করে গীতরস এসেচে নেমে মৃত্তিকার বন্ধুর পথরেখায়।

দীনদয়াল বাসায় এলেন। রাত আর নেই বল্লেই হয়। তামাক সেজে দাঁড়িয়ে আছে দলের ভৃত্য বিনু নাপিত। এমন সময় কে সম্ভ্রমের সুরে বলে উঠলো—"নবাইঠাকুর আসচেন।"

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন দীনদয়াল। একটু পরে নবাই ঠাকুর ঘরে ঢুকে দু'হাত জোড় করে নমস্কার করে বল্লেন—"চক্কত্তি মশায়, আজ আপনি আমাকে জ্ঞান দিলেন—"

সম্ভ্রান্ত, খ্যাতিমান, অবস্থাপন্ন, প্রৌঢ় কবিওয়ালা নবাই ঠাকুরের সামনে দীনদয়াল বিনয়ে, সঙ্কোচে এতটুকু হয়ে গেলেন। জিব কেটে বল্লেন—"ও কথা বলবেন না, হাতজোড় করচি, ওতে আমাকে লজ্জা দেওয়া হয়।"

—"আপনি ব্রাহ্মণ, হাতজোড় করবেন না আমার সামনে। ওতে আমার অপরাধ হয়—"

—"বসুন দয়া করে।"

—"এই বসলাম। বড্ড খুশি হয়েছি আজ আপনার—"

—"একটি অনুরোধ।"

—"কি?"

—"আমাকে 'তুমি' বলুন। আপনি বয়েসে আমার পিতৃব্যের সমান।"

—"বাড়ি কোথায় তোমার?"

—"ডুমরদ", হুগলী জেলা।"

—"তুমি নাম করবে বাবাজী। বয়েস হয়েচে আমার, অনেক দেখেচি, অনেক বলেচি। তুমি যে জ্ঞান আমায় দিলে আজ এমন কখনো পাইনি। আন্টুনি ফিরিঙ্গির সঙ্গে আসরে উতোর গেয়েছি, ভোলা ময়রার সঙ্গে উতোর গেয়েছি, হরু ঠাকুরকে দেখেছি, গদাধর চক্কত্তিকে নাকাল করেছি শান্তিপুরের ফুলদোলের আসরে। কিন্তু হ্যাঁ বাবা, আমি স্বীকার করছি আজ হেরে গেলাম তোমার কাছে। তুমি নতুন সুর এনে দিয়েচ কবিগানের মধ্যে। আমরা পুরোনো ঘুঘু। ছাইতে না জানি, পোড় চিনি। তোমার যে ক্ষমতা, তাতে অনেক বেশি নাম করবে তুমি। নতুন সুর শোনালে আজ সবাইকে। ভগবানের কাছে কামনা করি, দেশের নাম উজ্জ্বল কর। কেউ বোঝে না বাবা, আসল জিনিস ক'জন বোঝে? রঙ্গ-রস শুনতে আসে সবাই, কবিত্ব যে কি অমৃত, এর মধ্যে যে কি আনন্দ, একটা অনুষ্ঠান ভালোমতো লাগাতে পারলে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যেতে হয়, পুত্র-শোক ভুলিয়ে দেয় বাবা, পুত্র-শোক ভুলিয়ে দেয়, সে-সব বাইরের লোক কি বুঝবে? তুমি বুঝবে। তোমার মধ্যে সে জিনিস রয়েচে দেখলাম। আর দেখেছিলাম রাসু নৃসিংহকে, ফিরিঙ্গি হোক আন্টুনি, হাঁ, ভাষা বুঝতো বটে, রস চিনতো বাবা। তা সে-সব—"

দীনদয়াল নবাই ঠাকুরকে যথেষ্ট সম্মান দেখালেন। নিজেকে প্রৌঢ়, অভিজ্ঞ কবিওয়ালার ছাত্র বলে বিনয়-প্রণাম করলেন। বিদায় নেবার সময় সেদিন দুপুরে নবাইঠাকুরের চোখে জল এল।

নবাই এর পরে অনেকদিন বেঁচে ছিলেন, কিন্তু কোনো আসরে দীনদয়াল আর তাঁর সঙ্গে কবিগানে গাইতে নামেননি।

কি দিনই গিয়েচে সে-সব!..

সন্ধ্যা হয়ে এল কি?

দীনদয়াল ডাকতে লাগলেন, "বাবা রামু—"

কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না।

দেবীপ্রসাদ কাছে এসে বল্লে—"বাবা, কষ্ট হচ্চে?"

দীনদয়াল ঘাড় নেড়ে জানাতে গেলেন কষ্ট নেই, কিন্তু ঘাড় নড়লো না। শুধু ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন বড় ছেলের মুখের দিকে। দেবীপ্রসাদের চোখে জল পড়তে দেখে বল্লেন, "কাঁদছ কেন বাবা, আমি বড় আনন্দে আছি, কোনো কষ্ট নেই আমার। কেঁদো না।"

দীনদয়াল ভাবলেন তিনি কথাগুলো বল্লেন ছেলেকে, কিন্তু অনুচ্চারিত রয়ে গেল কথা, গলা দিয়ে সুরের আধার বার হয়ে এল না।

দেবী প্রসাদ বুঝতে না পেরে বল্লে, "জল খাবেন বাবা?"

নরহরি জোয়ারদার পেছন থেকে বল্লেন, "হুঁ, জল খেতে চাইচেন। কুষি করে গঙ্গাজল মুখে দাও।"

বিরক্ত হলেন দীনদয়াল। না, জল তিনি চাইচেন না। তাঁর মনে চমৎকার দুটি অনুপ্রাসবহুল পংক্তি এসেচে, কনিষ্ঠ পুত্র রামপ্রসাদকে সে-দুটি পংক্তি লিখে নিতে বলছিলেন। ওই ছেলেটি তাঁর নাম রাখতে পারে। জিনিস আছে ওর ভেতরে। তিনি লক্ষ্য করেচেন এটা মাঝেমাঝে। মাতুলবংশের স্থূল-বৈষয়িকতার ধারা হয়তো এই ছেলেটি কাটিয়ে উঠতে পারে।

পরম পুরুষ প্রভো নিত্যসনাতন

চিন্ময় তোমার নাম চিনে কোন্‌জন।

আমি দীন জ্ঞানহীন চিনি তোমারে

কেমনে হইব পার, মায়া পারাবারে।

না, কেউ লিখে নিলে না, কেউ বুঝতে পারলে না। আর এই নরহরি জোয়ারদারটা এখানে এসে জুটেচে যে কেন? ওটা নিতান্ত স্থূলবুদ্ধি বৈষয়িক, ওকে তিনি খুব ভালোই জানেন। প্রজা ঠেঙিয়ে খাজনা আদায় করা, মাথট আদায় করা, পার্বণী আদায় করা, হয়কে নয়, নয়কে হয় করা, জুয়োচুরি বাটপাড়ি ওর পেশা। ও কি বুঝবে তিনি কি চান? ও কি বুঝবে নবাই ঠাকুর, আন্টুনি সাহেব, ভোলা ময়রার কবিগানের মাধুর্য, বাহাদুরি, কৌশল, ঔজ্জ্বল্য ?

না, বড় সুখে ও আনন্দে কেটেছিল সে-সব দিন।

নতুন যৌবন দেহের, নতুন যৌবন মনের ও প্রাণের।

দিনরাত আকাশে-বাতাসে কিসের উন্মাদনা।এই কবিতা আসচে মাথায়, এই লিখে নিচ্চেন, আবার কবিতা এসে গেল মাথায়। কী পীড়ন করেচে তাঁর কবিতার নেশা! ঘুমুতে দিত না, খেতে দিত না, শুতে দিত না। রাত-দুপুরে মাথায় কয়েকটি পংক্তি এসে গিয়েচে, আর ঘুম নেই, উঠে তখুনি লিখতে বসে গেলেন।

একটা দিন মনে পড়লো। দিনহাটার বারোয়ারিতে কীর্তনওয়ালী বিনোদিনীর সঙ্গে আলাপ হল। বিনোদিনী ওঁর কবিগান শুনে মুগ্ধ হয়ে ওঁকে ডেকে পাঠাল। বিনোদিনী সেকালের খুব নামকরা কীর্তনগায়িকা। দীনদয়াল গেলেন ওর বাসায়। খুব সুন্দর সে, বয়েস তখন ত্রিশবত্রিশ—দীনদয়ালের সমবয়সী। একগাল হেসে এগিয়ে এল পৈঁছে বাজু বাজিয়ে, জলতরঙ্গ মলের বাজনার ঢেউ তুলে।

দীনদয়াল বল্লেন—"কি জন্যে তলব পড়েছে?"

বিনোদিনী বল্লে—"আমার কি ভাগ্যি! মেঘ না চাইতে জল! আসুন ঠাকুর মশাই, আসুন।"

দীনদয়াল বিনোদিনীর কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এখন তার সামনা-সামনি এসে হঠাৎ বড় সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন। মুখে বল্লেন—"কেন তলব পড়েচে?"

—"আমি কি ভাগ্যি করেছিলাম, আমার ঘরে আপনার মতো লোক?"

—"আমার ভাগ্যিই কি কম? আমি কার কাছে এসেছি আজ!"

তারপর দুজনে মিলে সুর ও কবিতার চর্চা হল কত রাত পর্যন্ত। দুজনে দুজনের গুণে মুগ্ধ, দুজনেই গুণী শিল্পী। গভীর রাতে দীনদয়াল বিদায় নিলেন, কিছু একটা প্রেমের কথা বলবার জন্যে বিনোদিনী কত আনচান করেছিল, দীনদয়াল বুঝেছিলেনও তা, সুযোগ দেননি। শিল্পীর সঙ্গে শিল্পীর বন্ধুত্ব তিনি অন্য পথে গিয়ে নষ্ট করতে চাননি।

ভোর হতে না হতে বিনোদিনীর ঝি এসে হাজির। বল্লে—"আপনাকে একটু ডেকেচেন, একটু বেলা হলে স্নান করে নিয়ে চলুন।"

—"স্নান করে কেন? তোমার মনিব কি দীক্ষা দেবেন নাকি?"

—"আপনি পায়ের ধুলো তো দ্যান কিরপা করে! আমি কি জানি?"

দীনদয়াল স্নান করে পরিষ্কার আনকোরা কাপড় পরে ও চাদর গায়ে দিয়ে চটি পায়ে বিনোদিনীর বাসায় গিয়ে পৌঁছলেন। গিয়ে দেখেন বিনোদিনীও স্নান করেচে, ভিজে চুলের লম্বা গোছা গেরো বেঁধে পিঠে ছড়িয়ে ফেলেচে, গরদের লালপাড় শাড়ি পরেচে। কুশাসন পাতা, কলার পাতে ফল ও মিষ্টি জলখাবার সাজানো, ঝকঝকে মাজা কাঁসার ঘটিতে জল বা চিনির পানা, মুখকাটা কচি ডাব বসানো পাথরের খোরা। দীনদয়াল গিয়ে দাঁড়াতেই বিনোদিনী সামনে লুটিয়ে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে বল্লে—"একটু জলসেবা করতে হবে এখানে আজ।"

দীনদয়াল হেসে বল্লেন—"আমি তো খাইনে কারো বাড়ি, তবে তোমার এখানে খাবো। তুমি সাধারণ মেয়েমানুষ নও।"

—"আমি আপনাদের শ্রীচরণের দাসী।"

—"অত বিনয় দেখানো ভালো নয়। কি আছে দাও খাই।"

—"আমি প্রসাদ পাবো কিন্তু, মনে রাখবেন।"

— "দেখি, পেটুক ব্রাহ্মণের পাতে কি থাকে!"

খাওয়ানোও তেমনি খাওয়ানো। কত কি ফলমূল, দু-রকমের চিনির পানা, ক্ষীরের মণ্ডা, ছানার মণ্ডা। যেমন বিনয় তেমনি আদর-যত্ন। হাতজোড় করে বল্লে—"আপনি যে গুণী লোক! দশ হাজার লোকের মধ্যে একটা গুণী লোক মেলে। আপনার সেবা করে ধন্য হলাম ঠাকুর।"

একটা পর্দা যেন সরে গেল তাঁর চোখের সামনে থেকে।

এতকাল পরেও বিনোদিনীর সেই বাসা...সেই জলপানের থালা স্পষ্ট দেখতে পেলেন। লালপাড় গরদের শাড়িপরা বিনোদিনী হাসিমুখে নতনেত্রে সামনে বসে।

বিনোদিনী বলচে— "কি ঠাকুর, সবগুলো খেতে হবে। ফেললে চলবে না, আপনি যে গুণী লোক, আপনাকে খাইয়ে তৃপ্তি পাই।"

—"সত্যি ?"

—"সত্যি না তো কি মিথ্যে ঠাকুর? খান খান।"

দীনদয়াল কি বলতে যাচ্ছেন, এমন সময় কি একটা গোলমালে তাঁর চমক ভাঙলো। চার-পাঁচজন লোক একমনে কথা বলচে। ওরা সামনে এসে দাঁড়ালো। সব কজনকে চিনলেন না, তবে ওদের মধ্যে একজন হোল বর্ধমান কাছারির ডিহিনবিশ কাসেমালি মল্লিক। ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন ওদের কথাবার্তা থেকে, কাসেমালি মল্লিক কোন্ ভালো কবিরাজ এনেচে পালকি করে। এখুনি দেখতে আসবেন তিনি।

কাসেমালি বলচে—'এই মাত্র খবর শুনলাম। সবগুলো কাছারিতে আজ গাঁতি-জমার বিলির দিন। ঘোড়া করে ফিরতে বেলা দু'পহর হয়ে গেল। নামাজ সেরে ভাতপানি গালে দিয়ে সবে শুইচি, শুনলাম চক্কত্তি মশায়কে ডুমুরদ'র ঘাটে অন্তর্জলি করতে নিয়ে গিয়েচে কাল রাত্তিরে। বলবো কি, শুনে মনটার মধ্যে কেমন করে উঠলো। আর থাকতে পারলাম না। চক্কত্তি মশায় গেলে এদিগরের ইন্দ্রপাত হয়ে যাবে যে। অমন গান কে বাঁধবে, অমন শিবের কুচুনি-পাড়া যাওয়ার পাঁচালি কে গাইবে? অমন অনুপ্রাসের ঘটা আর শুনবো না। আহা-হা, এখনো মনে আছে, গেয়েছিলেন ষষ্ঠীতলার বারোয়ারির আসরে—

পঞ্চভূত মন্ত্রপূত ভূত বিশ্বময়

ভূতে ভূতে ভূতোনন্দী, ভূত বিশ্বময়।

আহা-হা!..বলি রামজয় কবিরাজ মশাইকে ডেকে, এখুনি আমাকে ডুমুরদ'র ঘাটে যেতে হচ্ছে—তখুনি পাইক পাঠিয়ে দিলাম—

কাসেমালি ঝুঁকে পড়ে বলতে লাগলো—"ও চক্কত্তি মশাই, কেমন আছেন? চিনতে পারেন আমাকে?"

দীনদয়ালের মনে একটা প্রেমের ও ভাবের ঢেউ এল, তিনি কাসেমালি মল্লিককে খুব আপ্যায়িত করবেন ভাবলেন, বললেন—"এসো বাবা এসো। কেন কষ্ট করে কবিরাজ আনতে গেলে বাবা? আমি তো বেশ ভালো আছি। বোসো বাবা।"

কিন্তু কাসেমালি কি তাঁর কথা শুনতে পেলে না? লোকজনের দিকে চেয়ে বল্লে, "আহা, লোক চিনতে পারছেন না। কথাও বলতে পারচেন না। গলার সুরে অনুপ্রাসের মুক্তো বর্ষে গিয়েচে, আজ তাঁর গলার সুর বন্ধ। আল্লার মরজি।"

তারপর কবিরাজ এসে বসলো মাথায় শিয়রে। দেখেশুনে বল্লে, "সূচিকাভরণ দেবো। আহা, কি লোক। অমন লোক আর হবে না।"

দীনদয়াল দেখলেন,—"কাসেমালি মল্লিক উড়ুনির খুঁটে চোখের জল মুছলে।"

কাসেমালি বলচে—"কবিরাজ মশাই, দেবীপ্রসাদ আর তার ভাই ছেলেমানুষ। এরা কিছু বোঝে না। সূচিকাভরণ দিতে হয় যা করতে হয় আপনি করুন। যা খরচ হয় আমি দেবো। ওদের মত নেবার দরকার নেই। ওরা ছেলেমানুষ—কি বোঝে?"

দীনদয়াল মুখে বলতে গেলেন ভাবের আবেগে, "বাবা কাসেমালি, এই তো আমার সূচিকাভরণ! তোমাদের সকলের ভালোবাসাই আমার সব চেয়ে বড় সূচিকাভরণ বাবা। বেঁচে থাকো, আশীর্বাদ করি উন্নতি করো, ধর্মে মতি হোক। আমার দেবু-রামু যা, তুমিও তাই। আমার আর সূচিকাভরণে দরকার নেই বাবা।

আবার দেখলেন, বিনোদিনী সামনে বসে হাসি-হাসি মুখে বলচে,—"আপনি যে গুণী লোক ঠাকুর। আপনার সেবা করে ধন্য হই, খান।"

দীনদয়াল বিনোদিনীকে বল্লেন—"দ্যাখ্যো কি চমৎকার ছেলেটি। নিজের খরচে আমাকে সূচিকাভরণ দিতে কবিরাজ ডেকে এনেচে। ভালোবাসার সূচিকাভরণ দিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে তুললে তোমরা সবাই। নবাই ঠাকুরকে একদিন এই ওষুধে আমি বশ করেছিলাম, ও বিনোদিনী, মনে পড়ে?"

বিনোদিনী খিলখিল করে হেসে উঠলো বালিকার মতো।

একটু পরে দেবীপ্রসাদ রামপ্রসাদ দুই ভাইয়ে মিলে বাবাকে নাম শোনাতে আরম্ভ করলো—"ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম, ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম।"

নরহরি জোয়ারদার বলে উঠলো— "ধরাধরি করে গঙ্গার জলে নিয়ে চলো বাবা, আমি ধরচি একদিকে শিবচক্ষু—"

সবাই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।